গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই কবি—মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : তুলনামূলক অধ্যয়ন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে দেব-দেবীর প্রচারমূলক এক বিশেষ সাহিত্য শাখা হল 'মঙ্গলকাব্য'। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই বিশেষ শ্রেণির সাহিত্য শাখায় দেব-দেবীদের মহিমাকীর্তন করা হত। এই কাব্যগুলি যারা শুনতেন এবং যারা শোনাতেন উভয়েরই মঙ্গল হতো। তবে এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে দেব-দেবীদের মাহাত্মকীর্তন করা হতো তাঁদের আদি প্রতিষ্ঠা ছিল বাংলাদেশে লৌকিক দেব-দেবী রূপে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের আবর্তে এইসব 'গ্রামদেবতা' সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলা 'মঙ্গলকাব্য'গুলিতে এই লৌকিক দেবতাদের প্রতিষ্ঠা লাভের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

বাংলায় সেন যুগে সংস্কৃতির রূপান্তরের ফলে বৌদ্ধ ধারা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়। সে স্থান দখল করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভাবধারা। ব্যাকরণ, পুরাণ ও জ্যোতিষের মতো ধর্মাচার বহুল আলোচিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে তুর্কি আক্রমণের ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নিজস্ব স্থান থেকে সরে এসে সমন্বয়ের মধ্যদিয়ে রূপান্তরিত হতে থাকে। মানুষ ভয়ে, লোভে, ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশায় ইসলামী সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে ধর্মান্তরিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে হিন্দু সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সংস্কৃতি ও লোকায়ত বাঙালি সংস্কৃতির মিলন ঘটে - উদ্ভব হয় 'মঙ্গল দেবতাদের' পরম্পরায় রচিত 'মঙ্গলকাব্য' গুলি। পৌরাণিক ধর্মের অনুসারকদের দেব-দেবী নির্ভর ধর্মীয় তত্ত্বের সংকীর্ণতা, লৌকিক দেবদেবীদের তুচ্ছ করার প্রবণতা ক্রমশ ভঙ্গ হল। অরণ্য, গ্রাম প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের পূজ্য দেব-দেবীরা ক্রমশ উচ্চবর্গের দেবতাদের সঙ্গে অভিন্ন হলেন। সেকালের দৃষ্টিতে যে দেব-দেবীরা ছিলেন ব্রাত্য, তাঁদের পৌরাণিক দেববৃন্দের আসনে বসানো হলো। মনসা, চণ্ডী, ধর্মের মতো দেবতারা ভিন্ন মর্যাদা পেলেন। পৌরাণিক দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের সহাবস্থানের ফলে লোকদেবতাদের পৃথক ধারণা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠল।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত 'মঙ্গলকাব্য' নামক সাহিত্য শাখার দেব-দেবীদের মহিমাকীর্তনই ছিল মূল বিষয়। এই বিশেষ শ্রেণির সাহিত্যের অন্যতম হল 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'। ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিলনে এই কাব্যের সৃষ্টি। তবে বৈদিক সংহিতায় চণ্ডী নামের কোন উল্লেখ নেই। রামায়ণ, মহাভারতেও এই দেবতাকে আমরা পাই না। অর্বাচিন সংস্কৃত উপ-পুরাণ বা 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ', 'হরিবংশ' প্রভৃতিতে দেখতে পাওয়া যায় সকল শক্তি দেবতা কালক্রমে শিবের একমাত্র পত্নীরূপে পরিচয় লাভ করেছেন। তবে ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ নামক জনজাতিদের মধ্যে 'চাণ্ডী' নামক শক্তিদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই 'চাণ্ডী' হলেন শিকারের দেবী। অনেকের মতে দেবী 'চাণ্ডী' কালক্রমে চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন।

দেবী 'চণ্ডী'কে নিয়ে গড়ে উঠেছে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য। ষোড়শ শতাব্দীতে মানিক দত্ত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী এবং মাধব আচার্যের মতো কবিরা চণ্ডীমঙ্গলকে ব্রতকথার অবয়ব থেকে মুক্তকাব্যে — 'মঙ্গলকাব্যে' রূপদান করলেন। পরবর্তীকালে দ্বিজ রামদেব, রামানন্দ যতি, মুক্তরাম সেন প্রমুখ কবিরা কাহিনির মূল কাঠামোকে এক রেখে রচনা ভঙ্গীমায় পাণ্ডিত্যের প্রকাশ করলেন। এভাবে রচনা ভঙ্গীমায় পার্থক্যের কারণে কোন কোন কবি বহু আলোচিত হয়েছেন, আবার কোন কোন কবি আলোচনার অন্তরালে রয়ে গেছেন। এই দুই ধারার দু'জন কবি হলেন—মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি। প্রথম জন 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনায় তথা আলোচনায় শ্রেষ্ঠতর এবং দ্বিতীয় জন প্রায় অনালোচিত। এই দু'জন কবি দুই ভিন্ন শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে নিজস্ব পাণ্ডিত্যের গুণে 'চণ্ডীমঙ্গলকাব্য'কে ভিন্ন মর্যাদা দান করেছেন। উভয়ের কাব্যের মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়ন করা তথা অনুসন্ধান করা এই গবেষণা প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। উক্ত গবেষণার মধ্য দিয়ে এই দু'জন কবির রচিত কাব্যের অনেকগুলি নতুন বিষয় প্রদর্শনই আমাদের গবেষণা কর্মের লক্ষ্য।

অধ্যায় বিভাজন:

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : চণ্ডীদেবীর স্বরূপ ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা

দ্বিতীয় অধ্যায় : মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : কবি কথা

তৃতীয় অধ্যায়	:	মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : কাহিনিগত তুলনা
চতুর্থ অধ্যায়	:	মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : কাব্য শৈলীগত তুলনা
পঞ্চম অধ্যায়	:	মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : চরিত্র সৃষ্টিগত তুলনা
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	জীবনরসিক মুকুন্দ এবং সমালোচক রামানন্দ
উপসংহার	:	

ভূমিকা :

আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশেষ শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে আকস্মিকভাবে এ কাব্যের উদ্ভব হয়নি। বাংলায় নানান ধর্মীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'মঙ্গলকাব্যগুলি'র উদ্ভব ঘটেছে। বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, এই দেশে খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল। পাল রাজাদের সময় সম্ভবত বঙ্গদেশে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে স্থানীয় কতকগুলি লৌকিক ধর্ম সংস্কারের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে সেন রাজাদের সময় থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এই দেশে সমাজ জীবনের ওপর ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। আবার ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দিনের আক্রমণের পর প্রায় দেড়শ বছর হিন্দুরা শান্তিতে ছিল। উচ্চ অভিজাত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের হিন্দুরা নিচু তলার মানুষের লৌকিক ধর্মাচারকে ভাল চোখে দেখত না। ফলে হিন্দু ধর্মের মধ্যেও বিভেদ গড়ে ওঠে। দীর্ঘদিন অবহেলিত হওয়ার পর ইসলাম ধর্মের কাছে উৎপীড়িত হিন্দুরা আশ্রয় কামনা করেছিল। এভাবে ধর্ম জীবনের সুবিধা ভোগে বঞ্চিত হিন্দুরা বিধর্মের দিকে চলতে শুরু করায় সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পণ্ডিতেরা হিন্দু ধর্মকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। ফলে লৌকিক ধর্মের সঙ্গে আপোস করে। পৌরাণিক ধর্মের পণ্ডিতদের লোকধর্মকে তুচ্ছ করার প্রবণতা ক্রমশ ভঙ্গ হল। গ্রাম ও অরণ্যের সাধারণ মানুষের পূজ্য দেব-দেবীদের উচ্চ বর্ণের দেবতাদের সঙ্গে অভিন্ন করার চেষ্টা চলে। এভাবে চণ্ডী, মনসা, ধর্মদেবতার মতো দেব-দেবীরা আর্য-অনার্যের সমন্বয়ে একটি ভিন্ন ধারার সূচনা করলেন। যা সংহতি চেতনার প্রতীক।

প্রথম অধ্যায়

চণ্ডীদেবীর স্বরূপ ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা

মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা গড়ে উঠেছেন আর্য ও আর্যেতর উপাদানের সংমিশ্রণে। মনসা ও চণ্ডীর মতো দেবীরা এই সংমিশ্রণের ফলেই গড়ে উঠেছেন। মহাযান মতে তিনি 'বিষহরি' বা 'জাঙ্গুলিতারা', আবার ওরাওঁ উপজাতিদের মধ্যে তিনি পূজিতা 'মঞ্চামা' রূপে। দেবী চণ্ডীর উৎপত্তি হয়েছে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, অনার্য সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের সংমিশ্রণের ফলে। বৈদিক দেবদেবীদের মধ্যে চণ্ডী নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোন পুরাণেও এই দেবতার উল্লেখ নেই। কিন্তু উমা, দুর্গা, কাত্যায়নী, হৈমবতী, সতী ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে কয়েকটি সংস্কৃত উপপুরাণ—'দেবী-ভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', 'হরিবংশ' প্রভৃতিতে চণ্ডীনামের উল্লেখ রয়েছে। 'চণ্ডী' শব্দটির গঠনগত দিকটি প্রত্যক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যায় শব্দটি মূলত দ্রাবিড় শ্রেণির ভাষা থেকে আগত। মৌলিক শব্দটি ছিল 'চাণ্ডী' — অবাচীন সংস্কৃতে কালক্রমে তা চণ্ডী, চণ্ডিকা, চণ্ডেশ্বরী, চণ্ডা ইত্যাদি রূপ লাভ করেছে।

দেবী চণ্ডীকে নিয়ে লেখা হয়েছে 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'। ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গলের কয়েকজন বিখ্যাত কবি হলেন—'মানিক দত্ত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী ও মাধব আচর্য। তাঁরা চণ্ডীমঙ্গলকে ব্রতকথার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করেন। মঙ্গলকাব্যের আদিকবি হলেন কানাহরি দত্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কোন পুথি পাওয়া যায়নি। চণ্ডীর বিবিধ রূপের অনুসন্ধান ও চণ্ডীমঙ্গলের বিবিধ কবি ও কাব্য বিষয়ক আলোচনা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : কবি কথা

চণ্ডীমঙ্গলের দু'জন সুদক্ষ কবি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি। মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যখানি যেভাবে সকলের কাছে আলোচিত তথা খ্যাতি লাভ করেছে,

রামানন্দের কাব্যে ঠিক ততোটাই অনালোচিত। এই কবিদের কাব্য মধ্যে বর্ণিত আত্মপরিচয় থেকে কবিদের ব্যক্তিগত জীবন, বংশপরিচয় সম্পর্কে জানতে পারা যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যখানিতে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। রামানন্দের কাব্যে কিন্তু স্পষ্টভাবে সেরূপ কিছু উল্লেখিত হয়নি। দ্বিজ কৃষ্ণকান্ত নামক একজন ব্যক্তি (এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিতে রয়েছে) কবির ব্যক্তিগত জীবন বিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করেছেন। কবিদের উল্লেখিত রচনাকাল, ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে কাব্যের সঠিক মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : কাহিনিগত তুলনা

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' আখ্যানধর্মী কাব্য। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি রচনায় প্রত্যেকে প্রায় একই কাঠামোকে বজায় রেখেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কাব্য কাহিনি প্রধানত দুটি। আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড। আখেটিক খণ্ডে নীলাম্বর ও ছায়ার মর্ত্যে কালকেতু ও ফুল্লরা রূপে জন্মগ্রহণ, বিবাহ, কালকেতুর পশুশিকার, ফুল্লরার বারমাস্যা, দেবীর বরদান, কালকেতুর লড়াই এবং শেষে উভয়ের স্বর্গ যাত্রা, ধনপতি বা বণিক খণ্ডে ধনপতির সঙ্গে লহনা ও খুল্লনার বিবাহ, ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা, খুল্লনার ছাগল চড়ানো, শ্রীমন্তের দক্ষিণ পাটন যাত্রা এবং পিতাকে উদ্ধার, অন্তিমে চণ্ডীর পূজা প্রচার ইত্যাদি প্রধান ঘটনাগুলিকে কেউই বাদ দেননি। তবে কবিরা কাহিনির অভ্যন্তরে কিছু বিষয়ের পরিবর্তন করেছেন এবং নিজেদের স্বতন্ত্রতাকে চিহ্নিত করেছেন। কাব্যের প্রারম্ভে দেব- দেবীদের বন্দনাংশে মুকুন্দ অন্যান্য কবিদের মতো দেব- দেবীদের বন্দনা করেছেন, রামানন্দের বন্দনাংশ অনেক বেশি উৎকৃষ্টতর। কাহিনির অভ্যন্তরে কালকেতুর ফুল্লরার জন্মের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা মুকুন্দ দিয়েছেন রামানন্দ সে বিষয়গুলিকে এড়িয়ে গেছেন। এই বিষয়গুলিকেই আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : কাব্য শৈলীগত তুলনা

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি দুই ভিন্ন শতাব্দীর কবি। উভয়ের রচনায় দেবীর প্রতি ভাব নিবেদনের ভঙ্গীমা ভিন্ন। বাৎসল্য রসের আধিক্য রামানন্দের কাব্যে অধিক। মুকুন্দের কাব্যে বাৎসল্য রসের আধিক্য অধিক পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় না। মুকুন্দের কাব্য রামানন্দ গভীর ভাবে পাঠ করেছিলেন। কয়েকটি ভালো পঙক্তি একটু অদল-বদল করে রামানন্দ গ্রহণও করেছিলেন। মুকুন্দ ও রামানন্দের কাব্য শৈলীগত আলোচনা ও তুলনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : চরিত্র সৃষ্টিগত তুলনা

কাহিনি নির্ভর সাহিত্যে চরিত্র একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চরিত্র কাহিনিকে অবয়বদানে সহায়তা করে। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি নিজ সাহিত্য সৃষ্টির গুণে কাব্যের অন্তর্গত চরিত্রগুলিকে স্বকীয় ভঙ্গীমায় নির্মাণ করেছেন। মুকুন্দের সৃষ্ট চরিত্রগুলি অনেক বেশি মাটির মানুষের কাছাকাছি। তাঁর কাব্যে দেবতারাও অনেকসময় সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেছেন। সেখানে রামানন্দ দেব-দেবীদের অত্যন্ত সুচারুরূপে নির্মাণ করেছেন। তিনি কোন দেব চরিত্রের বর্ণনায় স্থূল রুচির পরিচয় দেন নি। তাঁর চরিত্রের কৌতূক সূক্ষ্মতর, রসবোধ গভীরতর। উভয় কবির চরিত্র সৃষ্টিতে দক্ষতা ও চরিত্রগত তুলনা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবনরসিক মুকুন্দ এবং সমালোচক রামানন্দ

মুকুন্দ চক্রবর্তী হলেন বাস্তবরসের স্রষ্টা। জীবনের পুঞ্জ পুঞ্জ, বাস্তব অভিজ্ঞতাকে

তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছেন। তাই মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে আমরা সমকালীন ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। মুকুন্দরাম সবার আনন্দদায়ক যে কাব্য রচনা করেছিলেন রামানন্দ কিন্তু তাকে ‘কাব্যদোষ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রামানন্দ কাব্যের অনেকটা অংশ জুড়ে মুকুন্দের কাব্যের সমালোচনা করে গেছেন। এক এক সময় মনে হতে পারে মুকুন্দের ‘কাব্যদোষ’ চিহ্নিত করাই ছিল রামানন্দের প্রধান উদ্দেশ্য। মূল গবেষণা প্রকল্পে মুকুন্দের কাব্যের জীবন-রসবোধ এবং রামানন্দের সমালোচনার পাণ্ডিত্য আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

মুকুন্দ ও রামান্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তুলনা, পাঠক সমাজে তাঁদের উভয়ের উৎকর্ষতা বিষয়ক একটি সামগ্রিক আলোচনা উপসংহারে তুলে ধরা হয়েছে।